Ekattorer Dinguli by Jahanara Imam

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com

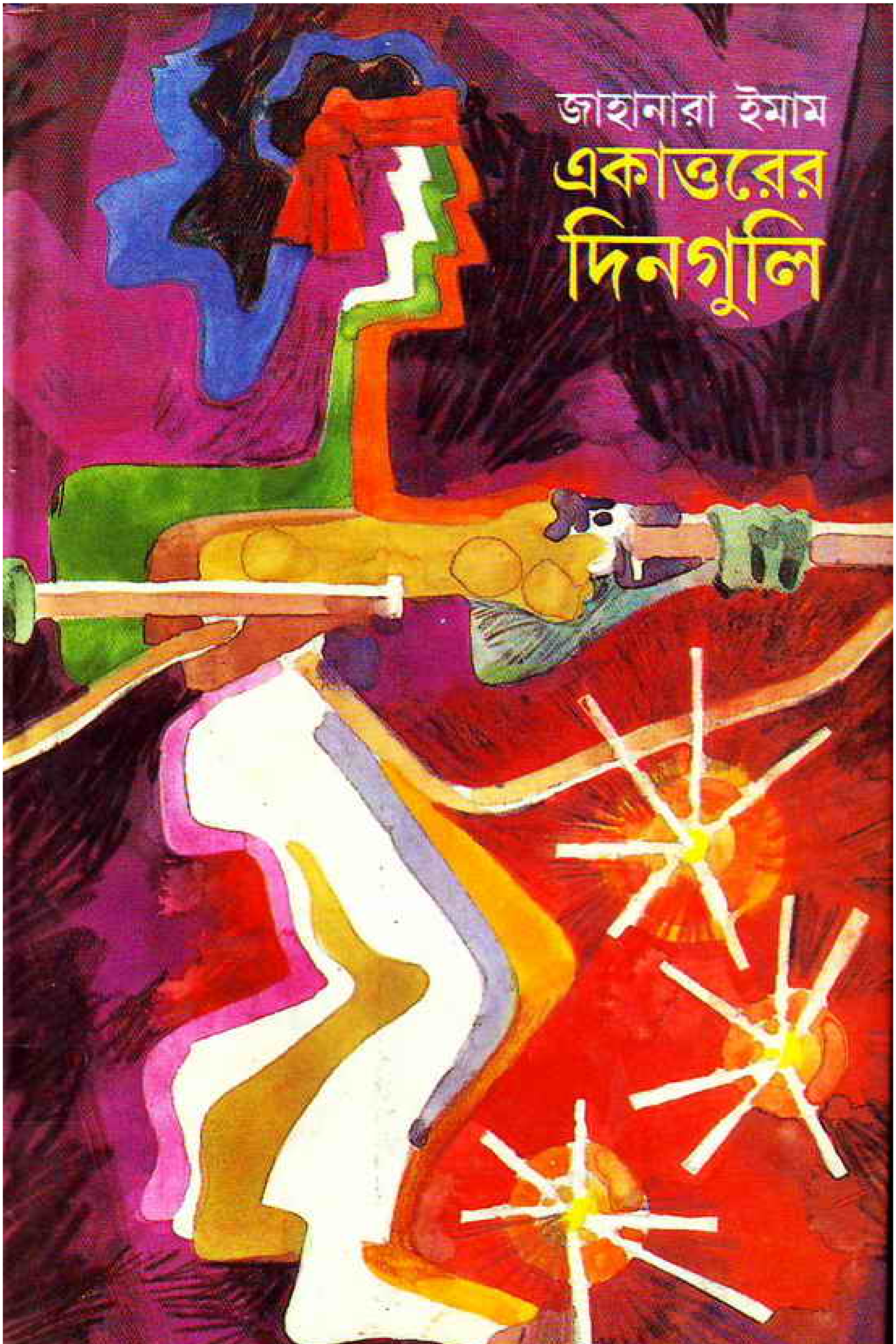
জাহানারা ইমাম
একাত্তরের
দিনগুলি

তবে তাই হোক। হৃদয়কে পাথর করে, বুকের গহীনে বহন করা বেদনাকে সংহত করে দুঃখের নিবিড় অতলে ডুব দিয়ে তুলে আনি বিন্দু বিন্দু মুক্তোদানার মতো অভিজ্ঞতার সকল নির্যাস। আবার আমরা ফিরে তাকাই আমাদের চরম শোক ও পরম গৌরবে মণ্ডিত মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর দিকে। এক মুক্তিযোদ্ধার মাতা, এক সংগ্রামী দেশপ্রেমিকের স্ত্রী, এক দৃঢ়চেতা বাঙালী নারী আমাদের সকলের হয়ে সম্পাদন করেছেন এই কাজ। বুকচেরা আর্তনাদ নয়, শোকবিহবল ফরিয়াদ নয়, তিনি গোলাপকুঁড়ির মতো মেলে ধরেছেন আপনকার নিভৃততম দুঃখ অনুভূতি। তাঁর ব্যক্তিগত শোকস্মৃতি তাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় আমাদের সকলের টুকরো টুকরো অগণিত দুঃখবোধের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, তাঁর আপনজনের গৌরবগাথা যুক্ত হয়ে যায় জাতির হাজারো বীরগাথার সঙ্গে। রুমী বুঝি কোন অলক্ষ্যে হয়ে যায় আমাদের সকলের আদরের ভাইটি, সজ্জন ব্যক্তিত্ব শরীফ প্রতীক হয়ে পড়েন রাশভারী স্নেহপ্রবণ পিতৃরূপের।

কিছুই আমরা ভুলবো না, কাউকে ভুলবো না, এই অঙ্গীকারের বাহক জাহানারা ইমামের গ্রন্থ নিছক দিনলিপি নয়, জাতির হৃদয়ছবি ফুটে উঠেছে এখানে।

April

1971

১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সরকার এখন সবকিছু স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টা করছে। ২৭ তারিখ সকাল থেকে প্রতিদিন রেডিওতে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে—সবাই যেন নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগ দেয়। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে কারফিউ থাকা সত্ত্বেও ২৭ তারিখে টিভি চালু করা হয়েছে।

কিন্তু অনুষ্ঠান দেখে মনে হচ্ছে ভূতুড়ে। অনুষ্ঠান ঘোষক-ঘোষিকা, সংবাদ পাঠক-পাঠিকা সব যেন ভৌতিক অবয়ব।

টেলিফোন ঠিক হয়েছে। এটাও বোধ হয় জীবনযাপন স্বাভাবিক দেখাবার প্রয়োজনেই করা হয়েছে। কিন্তু এখন যেন টেলিফোন ঘোরাবার আগ্রহ আর নেই। বরং সময় পেলেই এখন খালি রেডিও'র নব ঘোরাচ্ছি। পরশুদিন সামনের বাসার হুমায়ুন বলল, স্বাধীন বাংলা রেডিও নাকি কে শুনেছে। সে শোনে নি। তারপর থেকে মিনিভাই, লুলু, রঞ্জু অনেককেই জিগ্যেস করছি, কেউই এ পর্যন্ত নিজের কানে শোনে নি, তবে অন্যের মুখে শুনেছে।

রুমী-জামীকে গতকাল গুলশান থেকে নিয়ে এসেছি। ওরা থাকতে চায় না। তাছাড়া অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে—এখন যেহেতু সরকার সব স্বাভাবিক দেখাতে চায়, তাতে অন্তত এখনই ঘরে ঘরে ছেলেছোকরাদের টানাটানি করবে না। তবে রাস্তায় বেরোনো তরুণ ছেলেদের সম্বন্ধে যেসব ভয়াবহ খবর শুনছি, তাতেও তো বুক হিম হয়ে হাত-পা অবশ হয়ে পড়ছে। লুলু, রঞ্জু—আরো কয়েকজনের মুখে শুনলাম—ওরা দেখেছে ত্রিপথ ঢাকা ট্রাক, যার পেছনটা খোলা থাকে, সেই ট্রাকে অনেকগুলো জোয়ান ছেলে বসা, তাদের হাত পেছনে বাঁধা, চোখও বাঁধা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে। এই নিয়ে শহরে ক'দিন হুলস্থূল। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তার মুখেই এই কথা। ভয়ে রুমী-জামীকে একা বেরোতে দিচ্ছি না, রুমীকে গাড়িও চালাতে দিচ্ছি না। ড্রাইভার না থাকলে আমি চালাচ্ছি, রুমী-জামীকে পেছনে বসিয়ে। মহিলা চালক দেখলে রাস্তায় আর্মি কিছু বলে না। ওদের যত রাগ উঠতি বয়সের ছেলেদের ওপর। রাস্তার এক পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলা নিরীহ পথচারীও যদি অল্প বয়সী হয়, তাহলেও রক্ষে নেই। টহলদার মিলিটারি লাফ দিয়ে তার ঘাড় ধরে হয় ট্রাকে তুলবে, না হয় রাইফেলের দু'ঘা লাগিয়ে দেবে।

রাস্তায় বহু গাড়িতে দেখছি উর্দু নেমপ্লেট। এলিফ্যান্ট রোডের ছোট ছোট দোকানপাটের বেশ কয়েকটার সাইনবোর্ড পালটে উর্দুতে লেখা হয়েছে। দোকানে জিগ্যেস করলাম—'সাইনবোর্ড পালটেছেন কেন?' দোকানী জবাব দিল, 'এখন থেকে বাড়িতে, দোকানে, গাড়িতে, সবখানে উর্দুতে নামধাম-নম্বর লিখতে হবে। ওপর থেকে হুকুম এসেছে।'

এরপর যাকেই জিগ্যেস করি, সে-ই বলে হ্যাঁ, তাইতো শুনছি। এলিফ্যান্ট রোডের দুটো ছোট সাইনবোর্ড লেখার দোকানের সামনে গাড়ির লাইন লেগে থাকে; দোকানের ভেতরে সাইনবোর্ড লেখার টিন-প্লেটের স্তূপের জায়গা হয় না, দোকানের সামনের

ফুটপাত পর্যন্ত উপচে এসেছে।

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত বাড়ির সামনে, গাড়িতে নাম ও নম্বর-প্লেট উর্দুতে লিখতে হবে ? এই বাংলাদেশে ? আমাদেরকে ?

শরীফকে বললাম, 'এই যে ওপর থেকে হুকুম এসেছে, এই হুকুমটার উৎস বের করা যায় না ? দু'এক জায়গায় ফোন করে দেখ না। মোর্তুজা ভাই তো আগে এয়ারফোর্সে ছিলেন, ওঁকে জিগ্যেস কর না। তোমার বন্ধু আগা ইউসুফের সঙ্গে তো অনেক আর্মির লোকের জানাশোনা আছে, ওঁকে বল না কাউকে ফোন করে ব্যাপারটা জানতে।'

শরীফ বলল, 'দেখি, ক্লাবে দেখা হলে জিগ্যেস করব। এসব কথা ফোনে বলা ঠিক হবে না।'

আমি গোঁয়ারের মত বললাম, 'আমি কিন্তু এখনই নাম-নম্বর-প্লেট বদলাবো না। কাগজে যদি মার্শাল ল' অর্ডার হয়ে বেরোয়, তখন দেখা যাবে। তার আগে নয়।'

এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

মর্নিং নিউজ-এর একটা হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম : অ্যাকশান এগেইনস্ট মিসক্রিয়ান্টস অ্যাট জিঞ্জিরা—জিঞ্জিরায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

গতকাল থেকে লোকের মুখে মুখে যে আশঙ্কার কথাটা ছড়াচ্ছিল, সেটা তাহলে সত্যি? ক'দিন থেকে ঢাকার লোক পালিয়ে জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। গতকাল সকালে পাকিস্তান আর্মি সেখানে কামান নিয়ে গিয়ে গোলাবর্ষণ করেছে। বহু লোক মারা গেছে।

খবরটা আমরা গতকাল প্রথম শুনি রফিকের কাছে। ধানমণ্ডির তিন নম্বর রাস্তায় ওয়াহিদের বাসা থেকে রফিক প্রায় প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলেও মাঝে-মাঝে ঢুঁ মারে। শরীফের সঙ্গে বসে বসে নিচু গলায় পরস্পরের শোনা খবর বিনিময় করে।

রফিকের মুখে শোনার পর যাকেই ফোন করি বা যার সঙ্গেই দেখা হয়—তার মুখেই জিঞ্জিরার কথা। সবার মুখ শুকনো। কিন্তু কেউই খবরের কোন সমর্থন দিতে পারে না। আজ মর্নিং নিউজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেটার সমর্থন দিয়েছে। খবরে লেখা হয়েছে : দুষ্কৃতকারীরা দেশের ভেতরে নির্দোষ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে জিঞ্জিরায় সম্মিলিত এরকম [illegible] কারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছিল। এলাকাটি দুষ্কৃতকারীমুক্ত করা হয়েছে।

দুপুরের পর রঞ্জু এল বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে। এমনিতে হাসিখুশি, টগবগে তরুণ। আজ সেও

স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সোফাতে বসেই বলল, 'উঃ ফুপু আম্মা। কি যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে জিঞ্জিরায়। কচি বাচ্চা, থুথ্‌ড়ে বুড়ো—কাউকে রেহাই দেয় নি জল্লাদরা। কি করে পারল?'

আমি বললাম, 'কেন পারবে না ? গত ক'দিনে ঢাকায় যা করেছে, তা থেকে বুঝতে পার না যে ওরা সব পারে ?'

'ফুপু আম্মা, আমার এক কলিগ ওখানে পালিয়েছিল সবাইকে নিয়ে। সে আজ একা ফিরে এসেছে—একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তার বুড়ো মা, বউ, তিন বাচ্চা, ছোট একটা ভাই স-ব মারা গেছে। সে সকালবেলা নাশতা কিনতে একটু দূরে গেছিল বলে নিজে বেঁচে গেছে। কিন্তু এখন সে বুক-মাথা চাপড়ে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, সে কেন বাঁচল ? উঃ ফুপু আম্মা, চোখে দেখা যায় না তার কষ্ট।'

'অথচ কাগজে লিখেছে ওরা নাকি দুষ্কৃতকারী।'

শরীফ বাইরে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই আরেকটি বম্বশেল ফাটাল, 'শুনছো, হামিদুল্লাহ বউ-ছেলে নিয়ে নৌকায় করে ওদের গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। জিঞ্জিরার কাছে পাক আর্মির গোলা গিয়ে পড়ে ওদের নৌকায়। ওর ছেলেটা মারা গেছে, বউ ভীষণভাবে জখম।'

হামিদুল্লাহর বউ সিদ্দিকাকে ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। ভারি ভাল মেয়ে। হামিদুল্লাহ, ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সেও খুব নিরীহ নির্বিরোধী মানুষ। একটাই সন্তান ওদের, তার এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। খবর কাগজটা তুলে বললাম, 'অথচ সামরিক সরকার এদেরকে দুষ্কৃতকারী বলছে।'

বিকেলে রেবা-মিনি ভাই বেড়াতে এল। তাদেরও মুখ থমথমে। মিনি ভাইয়ের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় খোন্দকার সাত্তার—তিনিও তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকায় করে দেশের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। কামানের গোলার টুকরো তাঁদের নৌকাতেও গিয়ে পড়ে। নৌকায় ওর ছোট ভাই এবং আরও কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে।

৪ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

আজ কিটি ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সকালে এসেছে বিদায় নিতে। ওর রেডিওটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। খাবার টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'এটা তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। এখন প্রথমে তেহরানে যাব, তারপর কোথায় যাব, ঠিক নেই। এত ভারি রেডিও নিয়ে মুভ করা অসুবিধে।'

কিটি রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে তেহরান যাবে। ওর কাছে বেলু-ধলুদের ফোন নম্বর লিখে দিলাম। 'ওরা ইসলামাবাদে থাকে। ওদেরকে বোলো এখানে কি কি ঘটেছে। আর বোলো

আমরা ভাল আছি।'

কিটি আস্তে করে বলল, 'তোমাদের কিছু জিনিস আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি নিরাপদে রাখার জন্য।'

রুমী লাফ দিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের রেকর্ডটা তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আর চে গুয়েভারার এই বই দুটো।'

আমি শাহনাজের গাওয়া 'জয় বাংলা–বাংলার জয়' রেকর্ডটাও দিলাম।

রুমী বলল, 'আশা করব একদিন তুমি এগুলো ঢাকায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'

'তাই যেন হয়।' কিটির চোখ পানিতে ভরে গেল। শরীফের সঙ্গে কিটির দেখা হল না। কিটি আসার আগেই শরীফ বাঁকার সঙ্গে সাভারে গেছে। আমরা জানতাম না যে কিটি আজই চলে যাবে। মিঃ চাইল্ডারের বাসায় ফোন নেই, কিটি আগে জানাতে পারে নি।

কিটি চলে গেলে আমরা সবাই খানিকক্ষণ খুব মন খারাপ করে বসে রইলাম।

তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'নাঃ এভাবে বসে বসে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না। একটু হেঁটে আসি।'

এলিফ্যান্ট রোডে উঠতেই দেখি রিকশায় মা। আমাকে দেখে নেমে বললেন, 'পায়ে হেঁটে কোথায় যাচ্ছিস ?'

'কোথাও না। এমনিই।'

মা রিকশার ভাড়া চুকিয়ে আমার সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন, বললেন, 'চ, কাঁচাবাজারে যাই।' নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারের পোড়া জঞ্জাল এখনো সম্পূর্ণ সরানো হয় নি, তবু ওরই মধ্যে কিছু কিছু দোকানদার একটু সাফসুতরো করে পশরা নিয়ে বসেছে। একদম ভিড় নেই। নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারে আগে কোনদিন ঢুকি নি ভিড়ের ভয়ে। আর এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরলাম। ডিম অসম্ভব সস্তা—দু' টাকা হালি। মা আর আমি মিলে একসঙ্গে পঞ্চাশটা কিনলাম। মুরগি, শাকসব্জি সবই মনে হল পানির দর। কাছাকাছি গ্রাম থেকে যে যা পেরেছে, নিয়ে এসে বসেছে। কোনমতে বিক্রি হলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে যাবে, এমনি ভাব। ঝুড়ি হাতে মিনতি ছোকরা একটাও নেই, বয়ে নিতে পারব না বলে আর কিছু কিনলাম না।

বাড়ি ঢুকে দেখি শরীফ ফিরেছে সাভার থেকে। মুরগি, শাকসব্জি, মিষ্টি অনেক কিছু কিনে এনেছে। ভাগ্যিস, ডিম ছাড়া আর কিছু কিনি নি কাঁচাবাজার থেকে। মাকে একটা মুরগি, কিছু সব্জি ও মিষ্টি দিলাম। রুমীকে বললাম, 'যা, নানীকে পৌঁছে দিয়ে আয়।'

বাড়ির নাম ও গাড়ির নম্বর–প্লেট উর্দুতে লেখার কথাটা নেহাতই গুজব। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মর্মে কাগজে বিবৃতি দিয়েছে। শরীফ মন্তব্য করল, 'নেহাৎ ভিত্তিহীন গুজব বলে মনে হয় না। অতি উৎসাহী অবাঙালিরাই এটা প্রথম ছড়িয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তারপর, কানাকানি, বলাবলি, চাপা অসন্তোষ—এসব হতে হতে সরকারের টনক নড়েছে। তাই এখন কাগজে ঘোষণা দিয়ে বলছে এটা ভিত্তিহীন গুজব। যতো সব।'

আমি হেসে বললাম, 'তবু তো রেহাই। উর্দুতে নম্বর–প্লেট ? বাড়ির সামনে উর্দু হরফে 'কণিকা' লেখা ? উঃ মাগো। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।'

৯ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

কারফিউয়ের মেয়াদ ধীরে ধীরে কমছে। পাঁচ তারিখে ছ'টা–ছ'টা ছিল। ছয় তারিখ থেকে সাড়ে সাতটা–পাঁচটা দিয়েছিল। গতকাল থেকে আরো কমিয়ে ৯টা–৫টা করেছে।

বদিউজ্জামানরা সবাই মা'র বাড়ির একতলা থেকে চলে গেছে নিজ নিজ বাসায়।

রফিকরা ওয়াহিদের বাসা থেকে সরে মা'র বাড়ির একতলায় এসে উঠেছে। তিন নম্বর রোডে ওয়াহিদের বাসার কাছাকাছি মিলিটারিদের চলাফেরা খুব বেড়ে গেছে, কি একটা চেকপোস্ট না কি যেন হয়েছে। মা'র বাড়ি ছ'নম্বর রোডের ভেতরে বলে কিছুটা নিরিবিলি।

কপাল ভালো, আগের দিনই অজিত নিয়োগী চলে গেছেন। ওঁর কিছু বন্ধু প্রথমে আমাদের বাসায় এসে খোঁজ করেন। তারপর মা'র বাসা থেকে খুব সাবধানে ওঁকে গাড়ির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন। শুনলাম, গ্রামের বাড়িতে যাবেন। যেখানেই যান, ভালো থাকুন।

২৫ মার্চ কালরাত্রির পর কয়েকটা দিন রুমীর একেবারে থম ধরে ছিল। চেপা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল উদ্‌ভ্রান্ত চোখের দৃষ্টিতে ভেতরের প্রচণ্ড আক্ষেপ যেন জমাট বেঁধে থাকত। এখন একটু সহজ হয়েছে। কথাবার্তা বলে, মন্তব্য করে, রাগ করে, তর্ক করে। বন্ধুদের বাড়ি দৌড়োদৌড়ি করে, নানা রকম খবর নিয়ে আসে।

আজ বলল, 'জান আম্মা, বর্ডার এলাকাগুলোতে না যুদ্ধ হচ্ছে।'

শুনেই চমকে গেলাম, 'যাঃ তা কি করে হবে ? সবখানে তো মেরে ধরে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে।'

'তা হয়তো দিচ্ছে। পঁচিশের রাত থেকে যেখানে যেখানে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, পাকিস্তানিরা সেসব জায়গা আবার দখল করে নিচ্ছে—এটাও সত্যি। কিন্তু সেগুলো তারা এমনি এমনি দখল করতে পারছে না। সেসব জায়গায় তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। বহু জায়গায় বাঙালি আর্মি অফিসাররা রিভোল্ট করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ই.পি.আর, ই.বি.আর, পুলিশ, আনসারের লোকজন। ঢাকা থেকে বহু ছেলেছোকরা বর্ডারের দিকে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে যুদ্ধ করবে বলে। পাক আর্মি যেসব থানা, গ্রাম, মহকুমা জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানকার লোকজনেরাও বর্ডারের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ করতে।'

'পালাচ্ছে ঠিকই। তবে যুদ্ধ করতে কি ? ওরা তো সব পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে।'

'তা নিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আম্মা, যুদ্ধও হচ্ছে।'

'তুই এত কথা কোথায়, কার কাছে শুনিস ?'

'সবখানে—সবার কাছে। আমার বন্ধুদের অনেকের আত্মীয়স্বজন মফস্বল থেকে ঢাকায় আসছে। তাদের কাছে।'

বিশ্বাস হতে চায় না। হায়রে, আমার কোন আত্মীয় যদি এমনি মফস্বল থেকে আসত,

তাহলে তার মুখে শুনে বিশ্বাস হত।

রুমী বলল, 'আমার জানাশোনা অনেক ছেলে বাড়িতে না–বলে লুকিয়ে চলে গেছে।'

আমি অবিশ্বাসের সুরে বললাম, 'কই, কারা গেছে, নাম বলতো।'

'কেন, বাবু ভাই আর চিংকু ভাই।'

আমি আবার চমকালাম, 'ওরা ? ওরা তো চাটগাঁ গেল।'

রুমী হাসল, 'আসলে ওরা যুদ্ধেই গেছে।'

'কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে ?'

'তাতো ঠিক করে কেউ বলতে পারছে না। ওরা খোঁজ করতে করতে যাবে।'

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কি রকম ভালো মানুষের মত মুখ করে ওয়াহিদ এই তো কয়েকদিন আগে বলে গেল, মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাটগাঁর গ্রামের বাড়িতে। চিংকুও যাচ্ছে তার সাথে। চিংকুর ফুপা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ও ফুপার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে।

রুমী খুব আস্তে কিন্তু দৃঢ় গলায় বলল, 'আম্মা। আমি যুদ্ধে যেতে চাই।'

কি সর্বনেশে কথা। রুমী যুদ্ধে যেতে চায় ! কিন্তু যুদ্ধটা কোথায় ? কেউ তো ঠিক করে বলতে পারছে না। সবখানে শুধু জল্লাদের নৃশংস হত্যার উল্লাস—হাতবাঁধা, চোখবাঁধা অসহায় নিরীহ জনগণের ওপর হায়েনাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নিষ্ঠুর মত্ততা। যুদ্ধ হচ্ছে—একথা ধরে নিলেও তা এতই অসম যুদ্ধ যে কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের আধুনিকতম মারণাস্ত্র দিয়ে বিদ্রোহী বাঙালিদের গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে। সবখান থেকে তো সেই খবরই শুনতে পাচ্ছি। এই রকম অবস্থায় রুমীকে যুদ্ধে যেতে দিই কি বলে? মাত্র বিশ বছর বয়স রুমীর। কেবল আই.এস.সি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। ও যুদ্ধের কি বোঝে ? ও কি যুদ্ধ করবে ?

১০ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

কিটির রেডিওটা পাবার পর থেকে রোজই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান ধরার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। কতজনের কাছে শুনছি, তারা ধরেছে, অনুষ্ঠান শুনেছে। আমরাই শুধু পাচ্ছি না।

স্বাধীন বাংলা বেতারের বরাত দিয়ে আকাশবাণী যত খবর বলে, সব বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না। ওদের কিছু কিছু খবর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। নীলিমা আপা, সুফিয়া আপার মৃত্যুসংবাদটা ভুল ছিল। ঢাকার পতন, ক্যান্টনমেন্ট অবরোধ, টিক্কা খানের মৃত্যু—সবক'টা খবরই ভুল ছিল। টিক্কা খান বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, একের পর এক মার্শাল

ল'র বাঁধন–বেড়ি প্রচার করে যাচ্ছে। ২৫ মার্চের আগে, যে চীফ জাস্টিস বি. এ. সিদ্দিকী টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে রাজি হন নি, সেই বি. এ. সিদ্দিকীকে দিয়েই গতকাল গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ করানো হয়েছে। আজকের কাগজে দু'জনের ছবি বেরিয়েছে।

আজ সকালে খাবার টেবিলে সবাইকে বললাম, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সত্যি সত্যি আছে, না আকাশবাণীর বানানো মিথ—তা বের করতেই হবে। সকাল ছ'টা থেকে একেকজন দু'ঘন্টা করে রেডিও'র নব ঘোরাতে থাকবে। সারাদিন ধরে চলবে।'

জামী বলল, 'এখন তো ন'টা বেজে গেছে।'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ঠাট্টা রাখ। ন'টা থেকে এগারোটা তোমার ডিউটি।'

ফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে ধরলাম। ওসমান গনি স্যার। ঢাকা টিচার্স টেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন অবসর ভোগ করছেন। উনি বললেন, 'জাহানারা, রেডিও পাকিস্তান থেকে শিগগিরই তোমার কাছে লোক যাবে মনে হয়।'

আঁতকে উঠলাম, 'কেন স্যার?'

'মার্শাল ল' অথরিটি রেডিও'র কর্তাব্যক্তিদের হুকুম দিয়েছে, যেখান থেকে যেমন করে পার পুরনো টকারদের এনে প্রোগ্রাম করাও। আমার কাছে এসেছিল।'

'আপনি প্রোগ্রাম করেছেন স্যার?'

'না করে উপায় কি? বাড়িতে যখন রয়েছি। তোমাকেও যদি ফোনে বা বাড়িতে পেয়ে যায়—'

উনি কথা শেষ করলেন না।

স্যারকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। খাবার টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সবাইকে বললাম, 'ফোন বাজলে এখন থেকে তোমরাই ধরবে। আমাকে চাইলে আগে জেনে নেবে কে, কোথেকে করেছে। যদি বলে রেডিও থেকে করেছে, তাহলে বলবে আমি নেই। আর কেউ বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আগেই যেন বলে দিও না যে আমি বাড়িতে আছি। আগে জেনে নেবে কোথা থেকে এসেছে—

জামী আবার বলে উঠল, 'মা, তুমি যে টিক্কা খানের মত একের পর এক হোম ল' রেগুলেশান জারি করে যাচ্ছ!'

১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার ১৯৭১

চারদিন ধরে বৃষ্টি। শনিবার রাতে কি মুষলধারেই যে হল, রোববার তো সারাদিনভর একটানা। গতকাল সকালের পর বৃষ্টি থামলেও সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। মাঝে-মাঝে রোদ দেখা গেছে। মাঝে-মাঝে এক পশলা বৃষ্টি। জামী ছড়া কাটছিল 'রোদ হয় বৃষ্টি হয়, খ্যাঁক-শিয়ালীর বিয়ে হয়।' কিন্তু আমার মনে পাষাণভার। এখন সন্ধ্যার পর বৃষ্টি নেই, ঘনঘন মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বসার ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আমার জীবনেও এতদিনে সত্যি সত্যি দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে আসছে। এই রকম সময়ে করিম এসে ঢুকল ঘরে, সামনে সোফায় বসে বলল, ফুফুজান এ পাড়ার অনেকেই চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?'

'কোথায় যাব? অন্ধ, বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে কেমন করে যাব? কিন্তু এ পাড়া ছেড়ে লোকে যাচ্ছে কেন? এখানে তো কোন ভয় নেই!'

'নেই মানে? পেছনে এত কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো—'

'হল তো সব খালি, বিরান। যা হবার তাতো প্রথম দু'দিনেই হয়ে গেছে। জানো বাবুদের বাড়িতে তার মামার বাড়ির সবাই এসে উঠেছে শান্তিনগর থেকে?'

'তাই নাকি? আমরা তো ভাবছিলাম শান্তিনগরে আমার দুলাভাইয়ের বাসায় যাব।'

'তাহলেই দেখ-ভয়টা আসলে মনে। শান্তিনগরের মানুষ এলিফ্যান্ট রোডে আসছে মিলিটারির হাত থেকে পালাতে, আবার তুমি এলিফ্যান্ট রোড থেকে শান্তিনগরেই যেতে চাচ্ছ নিরাপত্তার কারণে।'

যুক্তিটা বুঝে করিম মাথা নাড়ল, 'খুব দামী কথা বলেছেন ফুপুজান। আসলে যা কপালে আছে তা হবেই। নইলে দ্যাখেন না, ঢাকার মানুষ খামোকা জিঞ্জিরায় গেল গুলি খেয়ে মরতে। আরো একটা কথা শুনেছেন ফুফুজান? নদীতে নাকি প্রচুর লাশ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে হাত বাঁধা, গুলিতে মরা লাশ।'

শিউরে উঠে বললাম, 'রোজই শুনছি করিম। যেখানেই যাই এছাড়া আর কথা নেই। কয়েকদিন আগে শুনলাম ট্রাকভর্তি করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে হাত আর চোখ বেঁধে, কতো লোকে দেখেছে। এখন শুনছি সদরঘাট, সোয়ারীঘাটে নাকি দাঁড়ানো যায় না পচা লাশের দুর্গন্ধে। মাছ খাওয়াই বাদ দিয়েছি এজন্যে।'

১৪ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

রুমীর খুব মন খারাপ। চীন পাকিস্তানকে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। চৌ এন লাই ঘোষণা করেছেন : স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন সরকার পাকিস্তানকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে। রুমী এবং তার মত যেসব প্রগতিশীল তরুণ সূর্যমুখী ফুলের মত চীনের দিকে মুখ করে থাকত, তারা সবাই ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছে। রুমীর ভাব দেখে এবং কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে—প্রাণের বন্ধু বিপদের মুহূর্তে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

এদিকে আরেক খবর। তিন-চারদিন আগে ঢাকায় এক নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। কাগজে খুব ফলাও করে খবর ছাপা হচ্ছে। খাজা খায়রুদ্দিন এর আহ্বায়ক। সদস্য ১৪০ জন। তার মধ্যে স্বনামধন্য হচ্ছেন আবদুল জব্বার খদ্দর, মাহমুদ আলী, ফরিদ আহমদ, সৈয়দ আজিজুল হক, গোলাম আযম।

গতকাল এই নাগরিক শান্তি কমিটির মিছিল বের হয়েছিল। আজকের কাগজে বিরাট করে ছবি ছাপা হয়েছে। ছবি দেখে আমরা খাবার টেবিলে বসে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম—এই এতগুলো লোক যোগাড় করতে সরকারের কি রকম খাটাখাটনি গেছে।

রুমী বলল, 'খুব বেশি যায় নি। মিরপুর মোহাম্মদপুরের বিহারিরা আর আহসান মঞ্জিলের বংশধররা—দুটো ডাকেই সবাইকে জড়ো করা গেছে।'

শরীফ বলল, 'তাছাড়া, ছবিটার মধ্যে ক্যামেরার কারসাজি আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখ, অনেক উঁচু থেকে এমন কায়দায় ছবি তোলা হয়েছে যে দুশো লোককেও মনে হবে দু'হাজার।'

১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

এত আটঘাট বেঁধে রেডিও'র লোকের হাত এড়ানো গেল না। সেই ১৯৫০ সাল থেকে রেডিওতে প্রোগ্রাম করি, সবাই আমার চেনা। তার মধ্যে নূরুন্নবী খান একটু বেশি। ওঁর বড় ভাই এহিয়া খানও রেডিওতে—বান্ধবী নূরজাহানের মামা বলে আমিও মামা ডাকি। সেই মামার ছোট ভাই নূরন্নবী খান একদিন সকাল আটটায় চলে এলেন আমাদের বাসায়। খাবার টেবিল ছেড়ে উধাও হবারও সময়টুকু পেলাম না।

নূরুন্নবী খান ঘরে ঢুকলেন দুই হাত জোড় করে। আমি কিছু বলার আগেই গড়গড়

করে বলে গেলেন—সামরিক আইন কর্তারা ওঁদের পিছে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে কাজ করাচ্ছেন। পুরনো স-ব বেতার শিল্পী—গানের, নাটকের, জীবন্তিকার, কথিকার—সব বিভাগের শিল্পীদের খুঁজে পেয়ে এনে অনুষ্ঠান করাতে হবে। নূরুন্নবী খানের বিভাগ হল কথিকা। উনি বললেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঁচ মিনিটের কথিকা প্রচার হচ্ছে। এই দেখুন, আমি বিষয়গুলোর একটা তালিকাও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এ থেকে আপনার সুবিধেমত একটা বিষয় বেছে নিন। যাতে আপনারও কোন বদনাম না হয়, আমারও পিঠ বাঁচে।'

আমি বেছে নিলাম 'গুজবে কান দেবেন না।'

আজ পহেলা বৈশাখ। সরকারি ছুটি বাতিল হয়ে গেছে। পহেলা বৈশাখের উল্লেখ মাত্র না করে কাগজে বক্স করে ছাপা হয়েছে : আজ বৃহস্পতিবার প্রাদেশিক সরকারের যে ছুটি ছিল, জরুরী অবস্থার দরুন তা বাতিল করা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে ঢাকা শহরে এবং দেশের সর্বত্র বর্ষবরণ অনুষ্ঠানও বন্ধ।

কিন্তু সে তো বাইরে। ঘরের ভেতরে, বুকের ভেতরে কে বন্ধ করতে পারে ?

১৬ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ক'দিন থেকে ধরতে পারছি। খুব অল্প সময়ের জন্য অনুষ্ঠান: সকালে ঘন্টা খানেক—আটটা থেকে ন'টা কিংবা সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন'টা। বিকেলে কোনদিন পাঁচটা থেকে সাতটা। কোনদিন আটটা থেকে দশটা। প্রচার সময়ের কোন স্থিরতা নেই। দু'তিনটি মাত্র গান ঘুরে ঘুরে বাজানো হয়, বাংলা-ইংরেজি খবর, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা, বিদেশী পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, মাত্র এইটুকু। তবু এইটুকুর জন্য আমরা সবাই কিরকম যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কথিকা। মুক্তিযুদ্ধ তাহলে হচ্ছে ? তবু এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর এই যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, এইটাই বা প্রচার করছে কোথা থেকে, কিভাবে ? রুমী বলে নিশ্চয় বর্ডার এলাকায় কোন জঙ্গলের ভেতর ট্রান্সমিটার লুকিয়ে ব্রডকাস্ট করে।

তাই হবে মনে হয়। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায় কোনদিন ? যদি পাক আর্মি কোনদিন খোঁজ পেয়ে যায় লুকোনো ট্রান্সমিটারের ? তাহলে ? কোন কোন দিন সময়মত বেতারকেন্দ্র ধরতে না পারলে অস্থির হয়ে উঠি বাড়িসুদ্ধ সবাই। এই বুঝি পাক আর্মি দিয়েছে গুঁড়িয়ে। কেউ কেউ বলে আসলে নাকি কলকাতা থেকে এসব প্রচার করা হয়। এটাও বিশ্বাস হতে চায় না। কলকাতা থেকে হলে নিশ্চয় এর চেয়ে ভালো প্রোগ্রাম হত, গানও এই দুটো তিনটে মাত্র ঘুরে ঘুরে দিত না। রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,'

নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেলে কররে লোপাট,' 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' আর 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম।' আরেকটা গান হয়, এটা আগে কোনদিন শুনি নি—'কেঁদো না কেঁদো না মাগো আর তুমি কেঁদো না।'

আর অনুষ্ঠানের শুরুতে বাজে শাহনাজ বেগমের সেই গান যেটার রেকর্ড আমি কিটির হাতে সরিয়ে দিয়েছি—

জয় বাংলা, বাংলার জয়।
হবে হবে হবে নিশ্চয়।'

অনুষ্ঠানের শেষেও এই গানটাই বাজানো হয়।

১৮ এপ্রিল, রবিবার ১৯৭১

বাদশা আসবে দশটায়, তার সঙ্গে রিকশায় করে পুরনো ঢাকায় যাব। শরীফ গাড়ি নিয়ে যেতে দিতে নারাজ—একই গাড়ি বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে দেখলে আর্মি সন্দেহ করতে পারে। আমি, রুমী বা জামীকে নিয়ে যেতে সাহস পাই নে। অতএব, ভাগ্নীজামাই বাদশাই আমার ভরসা। সে ডাক্তার মানুষ। তার কাজ-কারবার ঐ পুরনো ঢাকারই মিটফোর্ড হাসপাতালে।

শরীফ রুমী-জামীকে নিয়ে চুল কাটাতে যাবে ঢাকা ক্লাবে। ওরা বেরোবার উদ্যোগ করছে, হঠাৎ দেখি বেয়াই-বেয়ান এসে হাজির। শরীফের বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার আমিরুল ইসলাম, ওকে আমরা বেয়াই বলে ডাকি। রোববার সকালে ওরা প্রায়ই এরকম বেড়াতে বেরোয়। আজ কিন্তু ওদের মুখ থমথমে বিষণ্ণ। আরেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু নূরুর রহমানের মৃত্যুসংবাদ দিল। গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। পথে এক জায়গায় পাক আর্মি ওদের গোটা দলটার ওপর গুলি চালায়।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। আমাদের জানাশোনার গণ্ডির ভেতরে, খুব নিকট এক-জনের মৃত্যুসংবাদ এই প্রথম শুনলাম। এত হাসিখুশি, আমুদে মানুষ ছিল নূরুর রহমান। যেখানেই যেত, সবাইকে মাতিয়ে তুলত। সেই মানুষ আর্মির গুলি খেয়ে মারা গেছে?

বেয়াই বলল, 'নূরু একা গেলে হয়ত মারা পড়ত না। সে তার বন্ধুর পরিবারের অনেক লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল তার গ্রামের বাড়িতে। দলে ছোট ছেলেপিলেও ছিল।

'বন্ধুটি কে? তার কিছু হয় নি তো?'

'বন্ধুটির নাম ভিখু চৌধুরী। সে আর তার বউও মারা গেছে।'

ভয়ানকভাবে চমকে উঠলাম, 'ভিখু চৌধুরী? আমাদের ভিখু আর মিলি নয় তো?'

'মিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মিসেস চৌধুরীর নাম মিলিই তো বটে!'

ব্যাকুল হয়ে বললাম, 'ভিখু আমাদের আত্মীয়। এবং বন্ধুও। কবে ঘটেছে এ ঘটনা? কার কাছে শুনলেন?'

'তিন তারিখে। নূরুর কাজের ছেলেটাও ওদের সঙ্গে ছিল। সে এতদিন পরে ফিরে এসেছে। গতকাল আমার বাসায় গিয়ে সব বলেছে।'

উঃ! কি সাংঘাতিক। আজ আঠারো তারিখ, পনের দিন আগে ঘটে গেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। কেউ কিছু জানি না। কি রকম বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে বাস করছি আমরা ঢাকা শহরে। ভিখু অর্থাৎ মাসুদুল হক চৌধুরী সুলেখা প্রেসের মালিক, আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে তার বাসা। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়—ইদানীং যাওয়া-আসা একটু কমই হত। কিন্তু একসময়—অনেক বছর আগে এই ভিখু আর মিনি কতো প্রিয় ছিল আমাদের।

আমি বেয়াইকে জিগ্যেস করলাম, 'ভিখুর ছেলেমেয়েদের কথা কিছু জানেন? তারা বেঁচে আছে তো? আর কে কে ছিল দলে?

'ভিখুর ছেলেমেয়েদের কিছু হয় নি। ওর মা আর বোন গুলিতে জখম হয়েছে। তবে বেঁচে আছে।'

'ওরা কোথায় আছে এখন, জানেন কি?

'না, জানি না।'

বাদশা এল। শরীফ বলল, 'তোমরা কিন্তু একই রিকশাতে ঘুরো না। একেক জায়গায় নেমে রিকশা ছেড়ে দিয়ো যেন কিছু কেনাকাটা করতে বেরিয়েছ। দু'চারটে দোকানে ঢুকে এদিক-ওদিক খানিক হেঁটে তারপর আরেকটা রিকশা নিয়ো।'

লালবাগ দিয়ে শুরু করলাম। চকবাজারে নেমে দু'চারটে দোকান ঘুরলাম। চকবাজার না বলে তার ধ্বংসাবশেষ বলাই ভালো। তবু ওরই মধ্যে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে কিছু মানুষ যারা এখনো পাক আর্মির গুলি খেয়ে শেষ হয়ে যায় নি। তারপর ইসলামপুর, শাঁখারি পট্টি, ওয়াইজঘাট, পাটুয়াটুলী, সদরঘাট, নবাবপুর ঘুরে জিন্নাহ এভিনিউ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সবখানেই বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসলীলার চিহ্ন প্রকট, কিন্তু শাঁখারি পট্টির অবস্থা দেখে বুক ভেঙে গেল। ঘরবাড়ি যেভাবে ভেঙেছে, মনে হয় ভারি গোলা ব্যবহার করতে হয়েছিল। এতদিনে লাশ সব সরিয়ে ফেলেছে, কিন্তু বাতাসে এখনো পচা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মেঝেয়, বারান্দায়, সিঁড়িতে এখনো পানি রয়েছে, রাস্তাতেও পানি। মনে হচ্ছে জমাট রক্ত ধুয়ে সাফ করার কাজ এখনো শেষ হয় নি। প্রায় সব ঘরেরই দরজা-জানালা ভাঙা, কোন কোন দরজার সামনে চট ঝুলছে। চটগুলোর চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে এগুলো সদ্য কিনে ঝোলানো হয়েছে।

প্রতিটি বিধ্বস্ত ঘরের সামনে একটা করে কাগজ ঝুলছে। কি যেন সব লেখা।

কাছে গিয়ে দু'একটা পড়লাম। উর্দুতে লেখা কতকগুলো মুসলিম নাম। শুনলাম, বিহারিদের এ জায়গাটা ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা পেয়েছে, তারা বরাদ্দকৃত ঘরের সামনে নিজ নিজ নাম লেখা কাগজ সেঁটে বা ঝুলিয়ে আপন মালিকানার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছে।

২১ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

রুমীর সাথে ক'দিন ধরে খুব তর্কবিতর্ক হচ্ছে। ও যদি ওর জানা অন্য ছেলেদের মত বিছানায় পাশ-বালিশ শুইয়ে বাবা-মাকে লুকিয়ে পালিয়ে যুদ্ধে চলে যেত, তাহলে একদিক দিয়ে বেঁচে যেতাম। কিন্তু ঐ যে ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছি লুকিয়ে বা পালিয়ে কিছু করবে না। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছি। রুমী আমাকে বুঝিয়েই ছাড়বে, সে আমার কাছ থেকে মত আদায় করেই ছাড়বে।

কিন্তু আমি কি করে মত দেই ? রুমীর কি এখন যুদ্ধ করার বয়স ? এখন তো তার লেখাপড়া করার সময় কেবল আই.এস.সি পাস করা এক ছাত্র, এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে, আবার আমেরিকার ইলিনয় ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতেও ওর অ্যাডমিশন হয়ে গেছে। এই বছরের ২ সেপ্টেম্বর থেকে সেখানে ক্লাস শুরু হবে। ওকে আমেরিকা যেতে হবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে। সেখানে গিয়ে চার বছর পড়াশোনা করে তবে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আর এই সময় সে কি না বলে সে যুদ্ধ করতে যাবে ?

নাসিরের বাড়িতে বসেও এই তর্কই হচ্ছিল। ডাঃ নাসিরুল হক হলিফ্যামিলি হাসপাতালে শিশু বিভাগের ডাক্তার—সে আমেরিকা চলে যাবার চেষ্টা করছে। হয়ত সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই রওনা হয়ে যেতে পারবে। নাসির কিছুদিন আগেও আমাকে সাপোর্ট করেছে। আজ দেখি উল্টো সুর ? আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, 'বুঝেছি কেন রুমী ঘনঘন এ বাড়িতে আসে। এ কয়দিনে সে তোমাকে বুঝিয়ে-পটিয়ে ফেলেছে।'

রুমী নাসিরের কয়েক মাস বয়সের মেয়েটিকে লোফালুফি করতে করতে বলল, 'কি যে বল আম্মা, আমি তো আসি এই ডল্ পুতুলটাকে আদর করতে। মামার সাথে আমার এ নিয়ে কথাই হয় নি। কিন্তু আম্মা, তোমাকে গত দু'সপ্তাহ ধরে যা বুঝিয়েছি তার সিকি ভাগ মামাকে বললে মামা কন্‌ভিন্‌স্‌ড হয়ে যেত। আম্মা শোন, ছাত্রজীবন লেখাপড়া করার সময় এসবই চিরকালীন সত্য; কিন্তু ১৯৭১ সালের এই এপ্রিল মাসে এই চিরকালীন সত্যটা কি মিথ্যে হয়ে যায় নি ? চেয়ে দেখ, দেশের কোথায় সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় আছে? কোথাও নেই। সমস্ত দেশটা পাকিস্তানি মিলিটারি জান্টার টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা হয়ে উঠেছে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটরের চেয়েও আমাদের অবস্থা খারাপ। একটা গ্ল্যাডিয়েটরের তবু কিছুটা আশা থাকত, একটা সিংহের সঙ্গে ঝুটোপুটি করতে করতে সে জিতেও যেতে পারে। কিন্তু এখানে ? সেই ঝুটোপুটি করার সুযোগটুকু পর্যন্ত নেই। হাত আর চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, কট্‌কট্‌ করে কতকগুলো গুলি ছুটে যাচ্ছে, মুহূর্তে লোকগুলো মরে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থার মধ্য থেকে লেখাপড়া করে মানুষ হবার প্রক্রিয়াটা খুব বেশি সেকেলে বলে মনে হচ্ছে না কি ?'

'তুইতো এখানে পড়বি না। আই.আই.টি'তে তোর ক্লাস শুরু হবে সেপ্টেম্বরে, তোকে,

না হয় কয়েক মাস আগেই আমেরিকা পাঠিয়ে দেব।'

'আম্মা, দেশের এই রকম অবস্থায় তুমি যদি আমাকে জোর করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দাও, আমি হয়ত যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাহলে আমার বিবেক চিরকালের মত অপরাধী করে রাখবে আমাকে। আমেরিকা থেকে হয়ত বড় ডিগ্রি নিয়ে এসে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবো; কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটির সামনে কোনদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তুমি কি তাই চাও আম্মা ?'

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার উজ্জ্বল তারকা রুমী কোনদিনই বিতর্কে হারে নি প্রতিপক্ষের কাছে, আজই বা সে হারবে কেন ?

আমি জোরে দুই চোখ বন্ধ করে বললাম, 'না, তা চাই নে। ঠিক আছে, তোর কথাই মেনে নিলাম। দিলাম তোকে দেশের জন্য কোরবানি করে। যা, তুই যুদ্ধেই যা।'

এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সময় মনে হচ্ছে থেমে আছে গতকাল থেকে। গতকাল এই সময় নাসিরের বাড়িতে— আমি ও রুমী। কি বলেছিলাম আমি ? নাসির, লীনা, রুমী সবাই ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। রুমীও নিশ্চয় এতটা নাটকীয়তা আশা করে নি তার মায়ের কাছ থেকে। তবু সে উজ্জ্বল হাসিমুখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। যেন ছোট ছেলে অনেক কসরত করে মা'র কাছ থেকে আইসক্রিম খাবার পয়সা আদায় করে নিয়েছে। নাসির ফ্যাকাসে মুখে হাসবার চেষ্টা করে শুধু বলেছিল, 'বুবু !' লীনা তার বাচ্চাকে বুকে চেপে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

রাতে ঘুম হয় নি। কাউকে কিছু বলতেও পারছি না। সকালে নাশতা খাবার টেবিলে কাসেম আবার বলল, সে বাড়ি যাবে। এর আগে দু'বার ছুটি চেয়ে পায় নি। একজন যুদ্ধে যেতে চেয়ে অনুমতি পেয়েছে, কাসেম তো শুধু চারদিনের জন্য বাড়ি যেতে চায়। বললাম, 'ঠিক আছে, যাবে।'

তারপরই তৎপর হয়ে উঠলাম। শরীফকে বললাম, 'অফিসে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দাও, ঠাটারী বাজারে যাব।'

শরীফ বলল, 'তার চেয়ে তুমি এখনই তৈরি হয়ে গাড়িতে চল। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওইদিক দিয়ে বাজারে চলে যেয়ো।'

আজকাল রাস্তায় খালি গাড়ি দেখলেই আর্মির লোক থামিয়ে কয়েক ঘন্টা নিজের কাজে ব্যবহার করে নেয়। সারা শহরে এ একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু গাড়িতে মহিলা থাকলে থামায় না।

ঠাটারী বাজারের অবস্থাও অন্য জায়গার চেয়ে এমন কিছু ভালো না। ২৫ মার্চের রাতে পুড়ে যাবার পর এখন এখানে-ওখানে কিছু কিছু মেরামত করে বাজার বসছে। আমি ড্রাইভারকে বললাম, 'গাড়ি বন্ধ করে আমার সঙ্গেই এসো।'

বাজারের পরিবেশ মোটেও ভালো লাগল না। দগ্ধ, বিধ্বস্ত বাজারের মাঝে-মাঝে দোকানী লোকগুলো কেমন যেন অস্বাভাবিক নির্বিকারভাবে বসে আছে। চোখে বোবা দৃষ্টি। সারা বাজারজুড়ে পানি থইথই করছে। এত পানি কেন ? এর মধ্যে আর তো বৃষ্টি হয় নি। মনে হচ্ছে সকালে প্রচুর পানি ঢেলে পুরো বাজারটা ধোয়া হয়েছে। কেন ? হালে আবারো কিছু হয়েছে নাকি ? কেমন যেন গা ছমছম করতে লাগল। তাড়াতাড়ি কিছু গোশত আর কিমা কিনে চলে এলাম। দরকার নেই বাবা। নিউ মার্কেটে যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই চালাবো।

দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় লুলু এল। সেও একটা প্লেট নিয়ে খেতে বসে গেল। খেতে খেতে বলল, 'জানেন মামী, গতকাল নাকি বিহারিরা ঠাটারী বাজারে কয়েকজন বাঙালি কসাইকে জবাই করেছে।'

'ঠাটারী বা-জা-রে ! দূর ! বাজে কথা, আমি তো আজ সেখানে গিয়েছিলাম, কই, লোক জবাই হলে দোকানীদের মধ্যে যে রকম ভয়চকিত হাবভাব হওয়া উচিত ছিল, সেরকম তো কিছুই দেখলাম না। লোক জবাই হলে ওরা কি ওরকম নির্বিকার হয়ে বসে থাকতে পারত ? তোরা কোথা থেকে যে এসব গুজব ধরে আনিস।'

কথাটা উড়িয়ে দিলাম বটে কিন্তু গা শিরশির করতে লাগল।

খেয়ে উঠে কাসেমকে বললাম, 'নিউ মার্কেট থেকে গোটা কতক মুরগি আর কিছু মাছ কিনে আন। ওগুলো কুটে বেছে দিয়ে তারপর বাড়ি যেয়ো।'

২ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

কিছুই ভালো লাগে না। জীবনের, পৃথিবীর সব রসকষ তো আগেই শুকিয়ে গেছে। যে ভয়, আতঙ্ক আমাদের সবাইকে টানটান করে রেখেছে, তাও যেন শিথিল হয়ে আমাদের দিনরাতগুলোকে এলিয়ে দিয়েছে।

মা'র বাসায় গেছিলাম সকালে। নিচতলায় রফিকরা আর মণিরা ভাগাভাগি করে থাকছে। মণি আমার চাচাতো বোন। ওরা নাখালপাড়ায় থাকত। ২৫ মার্চের কয়েকদিন পর এ বাসায় এসে উঠেছে। মণির স্বামী, ছেলেমেয়ে, রফিক, জুবলী, তাদের দুটো বাচ্চা, কাজের মেয়ে আনোয়ারা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা পরিবারের এতগুলো লোক ছোট ছোট চারটে ঘরে থাকছে। বেশ কষ্ট করেই থাকছে। তবে রফিক ভাবছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি

রোডে ওর ভাই আতিকুল ইসলামের বাসায় উঠে যাবে কি না।

আমরা থাকতে থাকতেই মা'র মামাতো ভাইয়ের মেয়ে তারা আর তার স্বামী বেড়াতে এল। ওরা আসাদ গেটের কাছে নিউ কলোনিতে থাকে। ওরা বলল, এই অঞ্চলে একটা থাকার জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছে। কারণ ওদিকে বাঙালিদের থাকাটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। মিরপুর-মোহাম্মদপুরের বিহারিরা দিন দিন অত্যাচারী হয়ে উঠছে। সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভিন্ন জায়গাতে বাঙালিরা যে বিহারিদের মেরেছে, তার প্রতিবাদে তারা মিছিল বের করবে আগামীকাল। মোহাম্মদপুরের অনেক বাঙালিই ইতোমধ্যে বাসা ছেড়ে শহরের অন্য অঞ্চলে আত্মীয়দের বাসায় চলে গেছে।

আমি বললাম, 'বাঙালিরা বিহারিদের মেরেছে, তার প্রতিবাদে তারা মিছিল বের করবে? আর বিহারিরা যে বাঙালিদের কচুকাটা করেছে, তার বেলায় কে প্রতিবাদ করে?'

গতকাল প্রচুর রান্নাবান্না করেছি। কাসেম মাত্র চারদিনের ছুটি নিয়ে গেছে, কিন্তু জানি চারদিনের জায়গায় চোদ্দ দিন হয়ে যাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। আজ কোন কাজ নেই। তাই কি এগারোটার সময় গরম পানিতে সাবান গুলে একগুচ্ছ কাপড় ধুতে বসলাম ? বড় বড় বেড কভারও। কিছু একটা কষ্টসাধ্য, ভারি কাজ করা দরকার। কিছু পেটানো, আছড়ানো। সারাদিন ধরেই কাপড় ধোয়া চলছে।

২৪ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

মুজিবনগর বলে একটা জায়গায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে গত ১৭ এপ্রিল। ১০ তারিখেই নাকি এই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়, আকাশবাণী, বিবিসি থেকে সে খবর আগেই জানা গেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও নাকি এই প্রবাসী সরকারের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের এক বক্তৃতা প্রচার হয়েছে—আমর নিজের কানে শুনতে পাই নি কিন্তু অন্যদের কাছে শুনেছি।

এসব খবর শুনে আনন্দে উত্তেজনায় আমরা সবাই শিহরিত। তবু খবরগুলো সঠিক কি না, বিশ্বাস করব কি করব না—এসব ভাবনায় দুলতে দুলতে শুনি আরেকটা খবর। ১৮ তারিখে কলকাতার পাকিস্তানি দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছেন মিশনের পুরো দলবল নিয়ে।

এরপর ক'দিন ধরে ঢাকার কাগজে যেসব খবর বেরোল, তাতে ওদিকের খবরা-খবরের ব্যাপারে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ রইল না—

: কলিকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন বেআইনী দখল থেকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

গত ১৮ এপ্রিল ভারতীয় বেতারের এক খবরে বলা হয়েছে—কলিকাতার পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন অস্তিত্বহীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি পরিচয়দানকারী ব্যক্তিরা দখল করেছে।

: পাকিস্তান সরকার কলিকাতাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

: ঢাকায় ভারতীয় মিশন গোটাতে বলা হয়েছে।

এর আগে যে আকাশবাণী আর বিবিসিতে শুনেছিলাম ৬ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান হাইকমিশনের সেকেন্ড সেক্রেটারি কে. এম. শাহাবুদ্দিন আর প্রেস এটাচি আমজাদুল হক পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দূতাবাস ত্যাগ করেছেন, সে খবরটাও এতদিনে পুরোপুরি বিশ্বাস হল।

২৫ এপ্রিল রবিবার ১৯৭১

আজ নাসির আমেরিকার পথে জেনেভা রওনা হবে। প্লেন বিকেলে, কিন্তু যাত্রী ছাড়া অন্য কারো এয়ারপোর্টে ঢোকার হুকুম নেই। তাই দুপুরেই বাসায় গিয়ে নাসির ও লীনাকে বিদায় জানিয়ে এসেছি।

ঢাকার বিমানবন্দরে এখন কড়া সিকিউরিটি। শুনেছি, বিমানযাত্রীর গাড়িও এয়ারপোর্টের গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে পারে না। গেটের বাইরে রাস্তার ওপর নেমে যেতে হয়। গেটের ভেতরে বাউন্ডারি ওয়াল ঘেরা জায়গাটা কম বড় নয়— আগে এখানে একসঙ্গে প্রায় ৬০/৭০টা গাড়ি পার্ক করা যেত। এতটা চৌহদ্দি মালপত্রসহ হেঁটে তারপর এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ে ঢোকা। যাত্রীদের কষ্টের আর শেষ নেই।

বাসায় ফিরে আমের আচার দিতে বসলাম। এবার আচার অনেক বেশি করে বানিয়ে বয়েম ভরে রেখে দেব। দুর্দিনে আর কিছু না পাই, শুধু আচার দিয়েই ভাত খাওয়া যাবে।

নারিন্দা থেকে আতাভাই এসেছিলেন খোঁজখবর নিতে। খোদাভক্ত, পরহেজগার সদাপ্রসন্ন মানুষ, কিন্তু ইসলামের নামে পাকিস্তানিরা যা করছে, তাতে তাঁর প্রসন্নতা, শান্তি এবং ঘুম—সব নষ্ট হয়ে গেছে। বললেন, 'বুঝলে জাহানারা, ওদের আর বেশিদিন নাই। ইসলামের নামে ওরা যা করছে, তাতে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। মসজিদে বসে কোরান তেলাওয়াত করছিলেন ক্বারী সাহেব, তাকে পর্যন্ত গুলি করে মেরেছে। খোদার ঘরে ঢুকে মানুষ খুন ! মায়ের সামনে ছোট বাচ্চাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলের সামনে মাকে বেইজ্জত করেছে। ভেবেছে খোদাতা'লা সইবেন এত অনাচার ? ওরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনছে।'

বিহারিরা শেষ পর্যন্ত তাদের মিছিল বের করতে পারে নি, সরকার পারমিশান দেয় নি।

বাঁচা গেল। তবু গতকাল তারার মুখে শোনার পর থেকে রুমী-জামীকে একা কোথাও বেরোতে দিচ্ছি না।

২৮ এপ্রিল বুধবার ১৯৭১

আজকের কাগজে একটা খবর দেখে চমকে উঠলাম। নিউইয়র্কে পাকিস্তান দূতাবাসের ভাইস কনসাল মাহমুদ আলীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুঝলাম আরেকজন দেশপ্রেমিক বাঙালি পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করলেন।

বাঙালি কূটনীতিক বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করেছে—এটা খুশির খবর। তবে কি না মাহমুদ আলী আমাদের আত্মীয়—নাতজামাই। ওর শ্বশুর আবদুল খালেক শরীফের ভাগ্নে। এখন ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে সিলেটে রয়েছে। ২৫ মার্চের পর রটেছিল পাক আর্মি ওদের সবাইকে গুলি করে মেরেছে। পরে খবর পাওয়া গেছে খালেক বাবাজি আর লেবু বউমা প্রাণে বেঁচে আছে। ওদের কাছাকাছি বাড়ির এক ইঞ্জিনিয়ারকে আর্মি গুলি করে মেরে ফেলার পর ওরা গ্রামে পালিয়ে যায়। মাহমুদ আলী ওদের জামাই। কি জানি মাহমুদ আলীর কারণে পাক আর্মি ওদের আবার কোন অত্যাচার না করে।

কলিম এসেছিল। ওরা সবাই এখনো নিজ নিজ বাড়িতেই আছে—প্রাণ হাতে করে। ওর কাছে শহরে মিলিটারিদের অব্যাহত তৎপরতার কথা আরো কিছু শুনলাম। ট্রাকভর্তি চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা যুবকদের এখনো দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রায়। কলিম আরো বলল, 'মিরপুর-মোহাম্মদপুরে মাঝে-মাঝে ছুটকোছাট্‌কা গোলমাল হয়েছে। কিছু ছুরি মারামারি, কিছু ঘরবাড়িতে আগুন দেয়াদেয়ি।'

রঞ্জু এসে একটা মজার খবর দিল। গ্রীন রোড যেখানে ময়মনসিংহ রোডে গিয়ে মিশেছে, সেইখানে আজ বিকেল চারটার সময় শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। শ্রোতামন্ডলী : তিনটি ট্রাফিক পুলিশ, একটি মিলিটারি পুলিশ এবং একটি আর্মির জওয়ান !

১৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ১৯৭১

নাসরিনের বাবা মোতাহার সাহেব আমাদের বহু বছরের পরিচিত। ১৯৫০ সালে প্রথম যখন রেডিও প্রোগ্রাম করি, উনি তখন ছিলেন প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট। মাইকের সামনে কিভাবে, থেমে, দম নিয়ে পড়লে রিডিং পড়ার মত শোনাবে না, কথা বলার মতই শোনাবে—এই কায়দা উনিই আমাকে প্রথম শিখিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে মোতাহার সাহেব তাঁর এক বন্ধু আশরাফ আলী সাহেবের সঙ্গে মিলে 'খাওয়াতীন' নামে যে মহিলাদের মাসিক পত্রিকা বের করেন, তাতে প্রথমদিকে আমাকে বেশ কিছুদিন সম্পাদিকার কাজ করতে হয়েছিল। তারপর বহুদিন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। আমাদের গলিতে ওঁর মেয়েজামাই বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে, তাও জানতাম না।

হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, আমাদের বাসার সামনে মোতাহার সাহেব ! কি ব্যাপার? উনি শ্যামলীতে থাকতেন, এই রকম সময়ে ওদিকে থাকা নিরাপদ নয়, তাই ওঁর জামাই সামাদ ওঁকে সপরিবারে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছে।

মোতাহার সাহেব এ পাড়ায় আসার পর সন্ধেটা আমাদের ভালই কাটে। খুব মজলিসী মানুষ। কতো জায়গার খবর যে বলেন। একসঙ্গে সবাই মিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনি। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও ও সংবাদপত্রের খবর, আকাশবাণী ও বিবিসি'র খবর এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর চালাচালি করে আসল খবর বের করার চেষ্টা করি। এ কাজে মোতাহার সাহেবের জুড়ি নেই। ওঁর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়েরও শেষ নেই।

মা'র বাসায় গেছিলাম সকাল দশটায়। গিয়ে দেখি ওঁর জ্বর। রুমী সঙ্গে ছিল। ওকে দিয়ে রুটি আনিয়ে মা'র কাছে খানিক বসে বারোটার দিকে বাড়ি ফিরে দেখি—মোতাহার সাহেব আমাদের বসার ঘরে বসে কোথায় যেন ফোন করছেন। ওঁর চুল উষ্কখুষ্ক, মুখে উদ্বেগের ছাপ। কি ব্যাপার ? ওঁর জামাই সামাদের বড় ভাই আজ ভোরের কোচে পাবনা রওনা দিয়েছিল। খানিকক্ষণ আগে উনি লোকমুখে খবর শুনেছেন—মিরপুরের বিহারিরা নাকি মোহাম্মদপুরের বাঙালিদের মেরে ধরে শেষ করে দিচ্ছে। ও পথে যত বাস, কোচ যাচ্ছে সেগুলোও থামিয়ে যাত্রীদের মেরে ফেলছে।

পাবনার কোচ তো আরিচার পথে মোহাম্মদপুর, মিরপুরের ওপর দিয়েই যাবে। মারামারির খবর শোনার পর থেকেই উনি ফোন করছেন কমলাপুর কোচ স্টেশনে। রিং বেজে যাচ্ছে, কিন্তু কোচ স্টেশনে কেউ ফোন তুলছে না।

খবর শুনে আমারও বুক ধড়ফড় করতে শুরু করল। আমাকে বাসায় নামিয়ে রুমী আবার বেরোবার উদ্যোগ করছিল। এই খবর শোনার পর রুমীকে আর বেরোতে দিলাম না। শরীফকে তার ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসে ফোন করে খবরটা জানিয়ে তাড়াতাড়ি

বাড়ি ফিরতে বললাম।

মোতাহার সাহেব খানিক পরপরই এসে কোচ স্টেশনে ফোন করার জন্য ডায়াল করতে লাগলেন। রিং হয়, ফোন বেজেই যায়, কেউ ধরে না।

শেষে দুটোর দিকে মোতাহার সাহেব বললেন তিনি নিজেই কমলাপুর কোচ স্টেশনে যাবেন খবর নিতে।

উনি সামাদের ছোট ভাইকে নিয়ে কমলাপুরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন। আমরা কয়েকজন বাড়িতে স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না, বাড়ির সামনে গলিতে দাঁড়িয়ে হোসেন সাহেব, রশীদ সাহেব, আহাদ সাহেব—এঁদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে লাগলাম।

ঘন্টা দুয়েক পরে মোতাহার সাহেব বিস্তারিত খবর নিয়ে ফিরলেন। কোচের ড্রাইভার আড়াইটের দিকে কমলাপুর কোচ স্টেশনে ফিরলে তার মুখে সব খবর জানা যায়। মিরপুর ব্রিজের কাছে বিহারিরা ওদের কোচ এবং অন্য একটা ছোট বাস থামিয়ে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর সব যাত্রীকে নামায়। যাত্রীদের ভয়ার্ত চিৎকার, বিহারিদের রণহুঙ্কার ইত্যাকার হৈচৈ গোলমালের সুযোগ নিয়ে পাবনাগামী কোচের ড্রাইভারটি বাসের তলায় লুকিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পুরো হত্যাযজ্ঞটি প্রত্যক্ষ করে। বিহারিরা যাত্রীদের নামিয়ে ধারাল দা বড় চাকু—এসব দিয়ে মারতে থাকে। বাসে দু'জন যাত্রী ছিল তারা কেবল মক্কা থেকে হজ্ব করে দেশে ফিরেছে। বিহারিরা কেবল ওই হাজি দু'জনকে ছেড়ে দেয়। বাকি সবাইকে মেরে ফেলেছে। কয়েকজনকে তারা ছুরি মেরে ব্রিজের ওপর থেকে নিচে নদীতে ফেলে দিয়েছে—ড্রাইভারটা তাও দেখেছে। মিনিবাসটাকে বিহারিরা ভেতরের রাস্তায় আরো খানিকদূর নিয়ে গিয়েছিল। বড় রাস্তার মোড়ে কোচের যাত্রীদের শেষ করে লাশগুলো ওখানেই ফেলে রেখে উল্লাসে উন্মত্ত বিহারিরা ঐ মিনিবাসটার দিকে চলে যায়। তখন ড্রাইভার কোনমতে জান নিয়ে পালিয়ে কমলাপুর কোচ স্টেশনে চলে গিয়ে সবাইকে এই খবর দেয়।

২৩ এপ্রিল শুক্রবার ১৯৭১

বেশ গরম পড়ে গেছে। ক'দিন আগের তুমুল বৃষ্টির ফলে হিউমিডিটি বেড়ে গরমটা আরো অসহ্য লাগছে। সন্ধ্যায় গাড়ি-বারান্দার সামনের ছোট খোলা জায়গাটায় বেতের চেয়ারে বসেছিলাম। আজ মোতাহার সাহেব বেড়াতে আসেন নি। উনি সারাদিন ধ'রে মেডিক্যাল ও মিটফোর্ড হাসপাতারের মর্গে, থানায় এবং সম্ভব অসম্ভব আরো বহু জায়গায় ছুটে বেরিয়েছেন। শরীফ বলল, 'চল, আমরাও ওঁর বাসায় যাই। খোঁজ নিয়ে আসি কি হল।'

আমাদের বাড়ি থেকে দুটো বাড়ির পরে মেইন রোডের কাছাকাছি সামাদের বাসা। এটা আসলে সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ি—এ গলিতে ওঁর বাড়িটাই একমাত্র তেতলা—সামাদরা একতলায় ভাড়া থাকে।

সামাদদের বসার ঘরের একপাশে একটা খাট আছে। মোতাহার সাহেব সেই খাটে শুয়েছিলেন। আমাদের দেখে উঠে বসলেন। দু'দিনেই ওঁর দশ পাউন্ড ওজন কমে গেছে, মনে হল।

আমরা চেয়ারে বসে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোতাহার সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, 'কোথাও খোঁজ পেলাম না। মর্গে যত লাশ দেখলাম, সব পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করা। পিশাচগুলো প্রথম কোপ দিয়েছে পেটে। তারপর শরীরের অন্য সব জায়গায়। উঃ! এমন বীভৎস দৃশ্য জীবনে চোখে দেখি নি। পুলিশে সব লাশ তুলে আনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। ড্রাইভারতো নিজেই দেখেছে অনেকগুলোকে নদীর পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছে। ছুঁড়ে ফেলার পরিশ্রমে বোধহয় পারে নি, নইলে সব লাশই নিশ্চয় নদীতেই ফেলত।'

মোতাহার সাহেব চোখ বন্ধ করলেন।

'আপনি ওসব কথা এখন আর বলবেন না, মনেও করবেন না। আজ রাতে বরং দুটো ভ্যালিয়াম খেয়ে শোবেন।' এই বলে আমরা চলে এলাম।

সে রাতে ভ্যালিয়াম আমাদেরও খেতে হল। তা সত্ত্বেও ঘুম এল না। মাঝে-মাঝে তন্দ্রার মধ্যে চমকে উঠতে লাগলাম।

Ekattorer Dinguli by Jahanara Imam

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
suman_ahm@walla.com